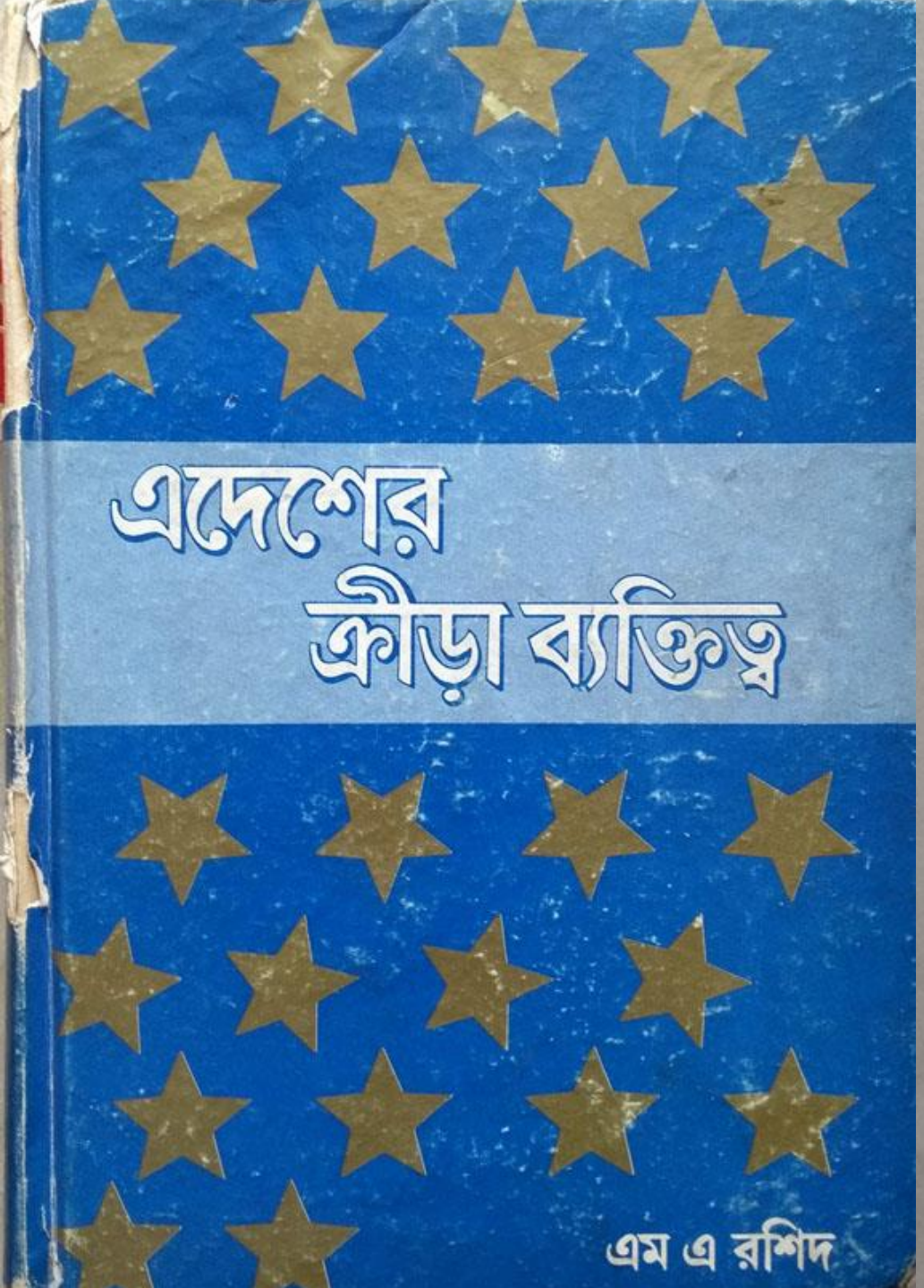

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর ১৯৮৯
অগ্রহায়ন ১৩৯৬

প্রকাশক
রাবেয়া খাতুন
৫৫, নয়াপল্টন, ঢাকা–১০০০

পরিবেশক
জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র
৫/ক, বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, ঢাকা

প্রভিন্সিয়াল বুক ডিপো
জাতীয় ষ্টেডিয়াম, ঢাকা

হাক্কানী পাবলিশার্স
জাতীয় ষ্টেডিয়াম, ঢাকা

কম্পিউটার কম্পোজে
বেষ্ট কালার ল্যাব লিঃ
৫৫, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা

মুদ্রনে
বুক প্রমোশন প্রেস
২৮ টয়েনবি সার্কুলার রোড, ঢাকা
প্রচ্ছদ
আমিনুর রহমান মাসুদ
মুল্যঃ একশত পচিশ টাকা

বিশ্ব সাঁতারের বিস্ময়

ব্রজেন দাস

থাকেন পুরনো ঢাকায়। বুড়ীগঙ্গার তীরে লাল কুঠির বাসায়। চড়ে বেড়ান অনেক আগের মডেলের একটি কালো গাড়ী। প্রায় সন্ধ্যায়ই তাঁকে পাওয়া যায় প্রেস ক্লাবে। তাঁর আগে ঢাকা ক্লাব সুইমিং পুলে। সাঁতারাতে। শরীরটাকে ঠিক রাখতে। সেদিন পুরানা পল্টনের খেলাধুলার হেড অফিস থেকে বেরিয়ে আসতেই পথের একপাশে দেখা। কিছুটা বিমর্ষ। বললাম কিসের এত দুঃখ। এতবড় সাতারুরত অযত্নে থাকার কথা নয়। কথাতে বুঝলাম কোন কিছুর জন্যে সাঁতরাচ্ছেন। কুল পাচ্ছেন না। কিনারা দেখেও হতাশ হয়েছেন। খেলাধুলায় কৃতিমানদের অবসর জীবনে ভাগ্য উন্নয়নের জন্যে ছুটাছুটিতে ক্রীড়া কতৃপক্ষের সক্রিয় সহযোগীতা ক্রীড়া সম্প্রদায়ের একটি অবশ্য প্রত্যাশা।

সান্ত্বনা তাঁর একমাত্র পুত্রকে ভর্তি করা হয়েছে বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। সরাসরি নবম শ্রেণীতে। বিশেষ বিবেচনায় ১৯৮৮ সালে তৎকালীন ক্রীড়া মন্ত্রীর বিশেষ নির্দেশে। ব্রজেন দাস এটাকে আন্তর্জাতিক সাঁতারে তাঁর অবদানের বিশেষ স্বীকৃতি হিসাবে মনে করেন। গর্বিত হন। অকপটে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেন।

আর্থিক প্রশ্নে কারো কোন সাহায্য না নিয়ে এখনও নিজ পায়ে দাঁড়িয়ে আছেন। কিন্তু সময়ের বিবর্তনে ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে কখনও অসহায় বোধ করেন। মনে হয় তাঁর কালো রংএর গাড়ীটার মতই একটা বিষাদের ছায়া তাঁর দেহমনকে যেন সব সময় আচ্ছন্ন করে রাখে। হয়ত নিরাপত্তার অভাবে ভুগছেন?

এ উপমহাদেশের শুধু নয় বিশ্বের সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাতরু ব্রজেন দাস। দুঃখ যে তাঁর জন্ম হয়েছে এক দেশে। সাঁতার কেটেছেন অন্য দেশে। অর্থাৎ সেই ব্রিটিশ ভারত এবং পাকিস্তান থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে বাংলাদেশে। তাঁর

কাছে সাঁতারে এদেশ একজন প্রশিক্ষক এবং সংগঠক হিসাবে যা পেয়েছে তাতে তাঁকে শুধু একটি রাষ্ট্রীয় পদকে ভূষিত করে তৃপ্ত থাকাটা যদি এ দেশের ক্রীড়ানীতিতে শেষ কথা বলে চিহ্নিত হয়, তবে ব্রজেন ক্রীড়াবিদদের মধ্যে বৈষম্য তুলে যে প্রশ্ন রাখতে পারেন, তার জবাব কেউই দিতে পারবেন না।

ব্রজেন দাস খেলার মাঠে একটি একক ইতিহাস। সম্পূর্ণরূপে স্বাতন্ত্রের দাবীদার। যে একাগ্রতা এবং নিষ্ঠা সাতারু জীবনে তিনি দেখিয়েছেন তাতে একজন অনন্য ক্রীড়াবিদরূপে তাঁকে চিত্রিত করতে অবাক করা অনেক কাহিনী ও ঘটনার অবতারণা করতে হয়।

বিস্তর বাধা ছিল তাঁর সাতারু জীবনে। শুধু উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং কল্পনার টানে তিনি এগিয়ে গিয়েছেন। সফল হয়েছেন। পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছেন। বিনিময়ে দেশের অগণিত মানুষের জন্য সুনাম কুড়িয়েছেন। সামান্য পুরস্কার নিয়ে নিজে সন্তুষ্ট রয়েছেন। সুদর দিনের প্রত্যাশায় অতীতের দিনগুলি কাটিয়ে এসেছেন। জীবনের এই বিবর্তনে তাঁকে নতুন করে আবিষ্কার করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সবচেয়ে বেশী তাঁদের যাঁরা ভাবেন এ দেশের খেলার কিংবদন্তীর নায়কদের নিয়ে। যাঁদের ঐতিহ্যে আগত বংশধররা চলার পথে আলো পাবে। পাবে দিকনিদের্শন। ক্রীড়াঙ্গন উদ্ভাসিত হবে নবউদ্দীপনায়।

ব্রজেন দাস ছবার ইংলিশ চ্যানেল সাঁতার কেটে পার হন। তাঁর আগে চারবার পর্যন্ত রেকর্ড ছিল। সর্বশেষ ১৯৬১ সালে যে সাঁতারটি কাটেন তাতে প্রায় সর্বনিম্ন ২১ মাইল ব্যবধানের এ প্রণালীটিতে সময় নেন ১০ ঘন্টা ৩৫ মিনিট। এটিও সেকালের বিশ্বরেকর্ড। তাঁর আগে মিশরের সাতারু আবদুল-আল-রহিমের রেকর্ড ছিল ১০ ঘন্টা ৫০ মিনিট। তখন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর ছিলেন আজম খান। গভর্ণর সাহেব ব্রজেনকে নিজের পুত্রের মত স্নেহ করতেন। সাঁতার শেষে বিলেত থেকে ফিরে এসে ঢাকা ষ্টেডিয়ামের হাজার হাজার মানুষের সমাবেশে ব্রজেনকে বীরের সম্বর্ধনা দেয়া হয়েছিল। সেই সমাবেশে আজম খান ব্রজেনকে বাঙ্গাল কা শের বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। বিনয়ী এবং নম্র স্বভাবের ব্রজেনের ভবিষ্যত নিয়ে গভর্ণর সাহেব ভাবলেও ব্রজেন নিজেই একজন অপেশাদারের মর্যাদায় থাকতে অধিক পছন্দ করতেন। বিনীতভাবে তা প্রকাশ করতেন। তাই কোনদিন নিজ সামর্থ থাকা পর্যন্ত কারো কাছে হাত পাতেন নি।

ব্রজেনের দীর্ঘ সাঁতার জীবনে তাঁর বাবা এবং মায়ের একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল। সাঁতরাতে তাঁরা তাঁকে কোনদিনই বাধা দেননি। নিরামিষ ভোজি বাবা

ব্রজেনের মাছ মাংস এবং ডিম খাবার প্রয়োজনীতায় সদা উদার ছিলেন। ধলেশ্বরী এবং মেঘনায় উত্তাল তরঙ্গের সঙ্গে খুব ছোট বেলায়ই তাঁর পরিচয় হয়েছিল। ব্রজেনের আদিবাড়ী বিক্রমপুরের সিরাজদীখান উপজেলার কুচিয়ামারা গ্রামে। একটু বড় হলেই ঢাকা শহরে বাবার ব্যবসার সন্নিকটে জুবিলী স্কুলে পড়তে আসেন। ক্ষুদে ব্রজেন ছেলে বেলায় ফুটবল, ক্রিকেট এবং ভলিবল খেলার প্রতি খুবই আকৃষ্ট ছিলেন। এক সময় জেলাদলে ভলিবল এবং ক্রিকেট খেলেন। কিন্তু সাঁতারে বাচ্চাদের সব সময় হারিয়ে দিতেন। এ বয়সের বাচ্চাদের কোন প্রশিক্ষক বা প্রতিযোগিতা তখন ছিল না। জগন্নাথ কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলিতে প্রতি বছর ক্রীড়া উৎসবগুলি যে ভাবে হত তাতে সারা শহরে সাড়া পরে যেত। জাঁকজমকপূর্ণ শহরের প্রায় সব স্কুল কলেজে অর্ধদিবস ছুটি দেয়া হত। এ অনুষ্ঠানগুলি দেখার জন্য বহুলোক ভিড় জমাত। প্রতিযোগিতায় যারা সাফল্য অর্জন করত তারা নিজ নিজ এলাকায় খুবই কদর পেত। এ সব দেখে খেলার প্রতি ঝোঁক ব্রজেনের ভীষণ বেড়ে যায়।

১৯৪৪ সালে একবার উপমহাদেশের তৎকালের প্রখ্যাত সাঁতারু পি কে ঘোষ সস্ত্রীক কিছু প্রদর্শনী সাঁতার কাটতে ঢাকায় আসেন। লাল কুঠির কাছে একটি পুকুরে তিনি ঢাকা শহরের প্রতি স্কুল থেকে একজন করে সাতারু নিয়ে একটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন। ব্রজেন বুঝতে পারেন যে তাঁর স্কুলের একজন ষণ্ডা মার্কা সিনিয়র ছেলে এতে সাঁতরাবে। তাই তাঁর পক্ষে এতে অংশ নেয়া সম্ভব নয়। তিনি তবু উপস্থিত হলেন পি কে ঘোষের কাছে। তাঁর মনের ইচ্ছা জানালেন। মিঃ ঘোষ রাজী হলেন। ব্রজেন সাঁতরালেন। প্রথম হলেন। সকলকে অবাক করলেন। এতটুকু ছেলে। প্রফুল্ল ঘোষ তাঁকে আশীর্বাদ করে গেলেন।

১৯৪৭ সালে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা শেষে ব্রজেন কলকাতা বেড়াতে যান। রাস্তায় একদিন বেড়াচ্ছেন। দেখতে পেলেন যাচ্ছেন সেই পি কে ঘোষ। দৌড়ে গিয়ে পা ছুঁয়ে প্রণাম করলেন। মিঃ ঘোষ তাঁকে প্রথম চিনতে পারেন নি। পরিচয় পেয়ে হেসে দিলেন। বাঙ্গাল বলে সম্বোধন করে উত্তর কলকাতার হেদুয়ায় তাঁর প্রতিষ্ঠিত সাঁতার ক্লাবের ঠিকানা দিলেন। সেখানে বিকেলে অবশ্যই যেতে বললেন।

ব্রজেনের জীবনের মোড় ঘুড়ে গেল। সেদিনই ক্লাবের দেয়া কসটিউম পরে ক্লাবের শ্রেষ্ঠ সাঁতারুকে স্বল্প পাল্লার সাঁতারে হারিয়ে দিয়ে সকলকে তাঁক লাগিয়ে দিলেন। প্রফুল্ল ঘোষ তাঁর প্রতিভা সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলেন। ষ্টাইলে তাঁর

তালিম ছিল না। কোন সাঁতার শিক্ষক কোনদিন কিছুই বলেন নি। মনের জোর দেহের জোর এবং সাঁতারে ঐকান্তিকতা তাঁকে সাফল্য এনে দেয়। টার্নিং তিনি তখনও জানতেন না। প্রফুল্ল ঘোষ নবীন সাতারুর দায়িত্ব নিজ হাতে তুলে নেন। হেঁদুয়ার ক্লাব কর্তৃপক্ষ তাঁকে বিদ্যাসাগর কলেজে ভর্তি এবং হোষ্টেলের যাবতীয় ব্যয় ভারের ব্যবস্থা করে দেন। ব্রজেন কলকাতায় প্রায় তিন বছর ছিলেন। এ সময় তাঁর সাঁতার প্রতিভা সারা ভারতে আস্তে আস্তে বিকশিত হতে থাকে। ১৯৪৯ সালে দেশ ভাগ হলে বাবার ডাকে তিনি চলে আসেন পূর্ববঙ্গে। পরবর্তীতে পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে উত্তরোত্তর কৃতিত্ব দেখাতে থাকলে সেখানে প্রতিহিংসার সূত্রপাত হয়। নাগরিকত্বের দোহাই দিয়ে তাঁকে প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে বারণ করা হয়। তিনি ১৯৫৩ সালে স্থায়ীভাবে ঢাকায় চলে আসেন। শুরু হয় নতুন জীবন। একটি সন্ধিক্ষণ। সূচিত হয় সাঁতারে এদেশের নতুন দিগন্ত।

পশ্চিমবঙ্গের দ্রুততম সাতারু ঢাকাবাসী ব্রজেনের ঐকান্তিক চেষ্টায় তেপান্ন সালেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঢাকা ও ফজলুল হক হলের মধ্যবর্তী পুকুরে প্রথম প্রাদেশিক সাঁতার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। মোট ৯ টির মধ্যে ৭টি ইভেন্টে অংশ নিয়ে ৭টিতে ব্রজেন প্রথম হন। টার্নিং-এ তাঁর দক্ষতা অন্যদের হটিয়ে দেয়। অন্যান্য সাতারুরা সেখান থেকেই টার্নিং শিক্ষার গুরুত্ব বিশেষভাবে উপলব্ধিতে নেয়। সাঁতারের নিয়ম কানুন এদেশে তখন কর্তৃপক্ষের অনেকেই পুরোপুরি জানতেন না। ব্রজেন তাঁদের তালিম দেন। এগিয়ে আসেন কীর্তিমান সংগঠক মহসীনভাই। গঠিত হয় ফেডারেশনের আওতায় সাঁতার কমিটি। সভাপতি ছিলেন জনাব বশির আহমদ (দুর্নীতি ব্যুরোর পরিচালক) এবং সম্পাদক হন জনাব আমিরউদ্দিন। ঐ সালেই পাকিস্তান সাঁতার প্রতিযোগিতা হয় লাহোরে। অংশ নেয় পূর্বপাকিস্তান। সার্বিক ভাবে প্রাধান্য থাকে সেনাবাহিনীর। ১০০ মিটারে ব্রজেনকে ফিনিশিং টাচে বিচারকদের ভ্রান্ত রায়ে সেনা সাতারু রমজানের কাছে ২য় স্থানে নেমে যেতে হয়। দলীয় ম্যানেজার আমিরউদ্দিন সাহেব আপত্তি জানাতে ব্যর্থ হন। বাঙ্গালী সাতাররা পরবর্তীতে ব্রজেনের নেতৃত্বে নতুন উদ্যমে কঠোর অনুশীলনে ব্রতী হয়।

এ সময় নারায়ণগঞ্জের শহরতলী কাশীপুর থেকে সংগঠক সাত্তার সাহেবের প্রচেষ্টায় একদল নবীন ও দূর্বষ সর্দার নামধারী সাতারু বেরিয়ে আসে।এ দলটি তৎকালীন জাতীয় সাঁতারে অসাধারণ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে যায়। তাঁদের

বংশধররাও পরবর্তীতে এ ঐতিহ্যে উল্লেখ যোগ্য অবদান রাখে।এ দেশের সাঁতারের ইতিহাসে বিশেষ ভাবে স্মরণীয় হচ্ছে কাশীপুরের সেই শান বাঁধানো ছোট্ট পুকুরের নাম। বাংলাদেশের সকল পুকুরকে ছাড়িয়ে গেছে। সর্দার ইদ্রিস (রাষ্ট্রীয় পদকে ভূষিত) সর্দার মুহম্মদ হোসেন, সর্দার আবু সাঈদ, সর্দার নুরউদ্দিন, সর্দার সিদ্দিকুর রহমান, সর্দার আবুল খায়ের, সর্দার ইসহাক, সর্দার ইব্রাহিম, সর্দার মোসলেউদ্দিন, সর্দার জব্বার, সর্দার নুরুল ইসলাম এবং মেয়েদের মধ্যে খালেদা, জহুরা, মুকতারা, রাবেয়া, সালেহা ও মাজেদার নাম কাশীপুরের সাঁতারের খাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। এরা এক নাগাড়ে দশ বছর তৎকালীন প্রাদেশিক সাঁতারে দলগত চ্যাম্পিয়ন হবার গৌরব অর্জন করে।

ব্রজেনের সঙ্গে এরা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে জাতীয় সাঁতার বিপ্লবে শরিক হয়ে সাঁতারের মজবুত ভিত রচনা করে। এদের সঙ্গে মালেক, আসাফউদ্দৌলাহ, কামরুল হুদা, নুরুল ইসলাম মাহবুব ও কাদের (বগুড়া) ডলিক্রজ এবং বাংলাদেশ রেডিওর এক কালের আঞ্চলিক পরিচালক ফখরুল ইসলামের নামটিও এসে যায়। পরবর্তীতে সর্দার ইদ্রিসই ব্রজেনের সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ান। ব্রজেনের সঙ্গে শেষের দিকে সমান তালে এগিয়ে যান। সেকালে নৌবাহিনীতে আরশাদ ও বিমান বাহিনীতে সিরাজুল ইসলামও বাঙ্গালী সাতারু হিসাবে বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে বেরিয়ে আসেন।

পরের বছর। ১৯৫৪ সালের কথা। ঢাকায় পাকিস্তানের অলিম্পিক হবে। চীফ সেক্রেটারী নিয়াজ মোহাম্মদ খান তখন ই পি এস এফ-এর সভাপতি। ফেডারেশনের প্রস্তুতি বিষয়ে এক সভায় তিনি জানতে চান যে কোন বিষয়ে পূর্বপাকিস্তানের পুরস্কার পাবার সম্ভাবনা বেশী। সবাই চুপ। অগত্যা মহসীন ভাই মুখ খুলেন। বলেন যে, একটি ইভেন্ট আছে।কিন্তু তা প্রতিযোগিতায় অন্তর্ভুক্ত হয়নি। কারণ ঢাকায় নির্ধারিত মানের কোন সুইমিং পুল নেই।

এন এম খান সঙ্গে সঙ্গে ঢাকা ষ্টেডিয়ামের নির্মাতা ফার্ম ওমর সন্সের মালিককে টেলিফোনে সেই সভায় ডেকে নিয়ে এলেন। ঠিকাদার সাহেব এত অল্প সময়ে সম্ভব নয় বলে বিনীতভাবে পেশ করলেন। এন এম খান জেদ ধরলেন। করতেই হবে। ওমর সাহেব অগত্যা রাজী হলেন। করাচী থেকে ইঞ্জিনিয়ার নিয়ে এলেন। কাজ শুরু হল। আড়াই ফুট মাটি কাটার পর নীচ থেকে পানি উঠতে শুরু করল। সব বড় বড় প্রকৌশলীরা সমবেত হলেন। সিদ্ধান্ত নিলেন। পুলটি মাটির উপর নির্মাণ করতে হবে। তাই হল। মতিঝিলে বাংলাদেশ

ব্যাংকের কাছে তখন পঞ্চাশ হাজার গ্যালন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি পানির ট্যাংক ছিল। সেখান থেকে লাইন টানা হল। অথচ পুলের দরকার ছিল ৭ লক্ষ গ্যালন। প্রতিযোগিতায় প্রথম দিনে শেষ পর্যন্ত পাশের খাল থেকে ফায়ার সার্ভিসের সহায়তায় পানি এনে বেলা ১টা নাগাদ পুলটি ভরা হয়। বেলা ২ টায় প্রতিযোগিতা শুরু হয়।

সাঁতারে ১০০ মিটারে প্রথম বাঙ্গালী পূর্ব পাকিস্তানের পক্ষে সোনার মেডেল পান ব্রজেন দাস। একই সময়ে ঢাকা ষ্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত এ্যাথলেটিকসের হাইজাম্পে সর্ব প্রথম সোনা পান ১৯৮০ সালে রাষ্ট্রীয় পদকে ভূষিত বাঙ্গালী মেয়ে জিনাত আহমেদ। এ প্রতিযোগিতায় ব্রজেন পর পর ৪ টা সোনা জিতেন। এক মাইলের সাঁতারে তাঁকে অযোগ্য বলে ঘোষণা করলে পরদিন সকল পত্রপত্রিকা ভীষণভাবে সোচ্চার হয়ে ওঠে। খেলাধুলায় বাঙ্গালীর প্রধান্য সেকালে পাকিস্তানে কোন কোন মহলের কাছে মনে প্রাণে গৃহীত হয়নি। এ নিয়ে কথাবার্তা হয়েছে। কিন্তু কোন আন্দোলন হয়নি। না হলেও হবার পথ প্রশস্ত হচ্ছিল। এতে অবশ্যই খেলাধুলায় অনাচার ধরা পড়ছে। প্রতিবাদ কম উঠেছে। এটা বাঙ্গালী হিসাবে সম্ভবত আমাদের একধরনের শিষ্টাচার। এটি একটি বড় কারণ যার ফলে খেলাধুলায় ব্যাপকভাবে আমরা পিছিয়ে আছি। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপে এগিয়ে যেতে ব্যর্থ হচ্ছি।

ব্রজেন দাসের কৃতিত্ব নিয়ে এদেশে কেউই ইতিহাস রচনা করেনি। অল্প স্বল্প কথায় টুকিটাকি খবর সংবাদপত্রে পরিবেশন করে বা দুএকটি ছোট খাটো প্রবন্ধ লিখে তৃপ্তি যাঁরা পেয়েছেন এবং তৃপ্ত যাঁরা হয়েছেন তাঁরা যে একই জাত এ কথাটাই ব্রজেনকে নিয়ে লিখতে বসে আজ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে বা কায়েমী স্বার্থের উর্দ্ধে যে নেতৃত্ব, সে নেতৃত্বেই রয়েছে সত্যিকার ব্যক্তিত্ব। এই ব্যক্তিত্বই একটি জাতির সর্বশ্রেষ্ট আকাঙ্ক্ষা। চলার পথের দিশারী। আগত দিনের মানুষের জন্যে আশার বাণী।

ব্রজেনের সাঁতারে এগুতে সংগঠন ছিল অপরিপক্ক। অর্থ ছিল অপর্যাপ্ত। প্রশাসন ছিল দ্বিধাবিভক্ত। ব্রজেন দমেনি। মনের তাগিদে, নিজের বিশ্বাসে এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদের কারো কারো আশ্বাসে প্রথম এশীয়বাসী হয়ে ইংলিশ প্রণালী সাঁতারের বাসনা তাঁর মনে অতি মজবুত হয়ে দানা বেঁধেছিল।

ধীর স্থিরে নিজপন্থায় তিলে তিলে দৃঢ় প্রত্যয়ে এগিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। প্রতিটি প্রতিযোগিতার আগে ও পরে ব্রজেন একই ধারায় কঠোর অনুশীলন

করতেন। শরীরের শক্তি ও প্রয়োজনীয় ওজন বৃদ্ধির জন্যে নির্ধারিত ব্যায়ামের জন্য স্বীয় উদ্ভাবিত দেশীয় সরঞ্জাম ব্যবহার করতেন। কলকাতার প্রশিক্ষণের এবং প্রাথমিক সফলতায় তাঁর নাম প্রচার হবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি যেখানেই গিয়েছেন সেখানেই সাঁতারে কৃতিত্ব দেখায়েছেন এবং মানুষের অকুণ্ঠ প্রশংসা কুড়িয়েছেন। সাঁতারে আরো উন্নত ফলাফল দেখাতে সর্বদা তৎপর থেকেছেন।

১৯৫৬ সালে তিনি করাচীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দলের অধিনায়ক হয়ে আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় সাঁতারে অংশ নিয়ে প্রতিটি ইভেন্টে প্রথম হয়ে তার দলকে প্রথম বারের মত চ্যাম্পিয়ন করান। এ দলের ম্যানেজার ছিলেন তৎকালীন ছাত্র খেলোয়াড়দের প্রিয় শিক্ষক ও সদাজাগ্রত পৃষ্ঠপোষক ফজলুল হক হলের খ্যাতিমান প্রভোস্ট মরহুম ডঃ মজহারুল হক এবং সহকারী ম্যানেজার ছিলেন ঢাকা জগন্নাথ কলেজের তৎকালীন খেলাধুলার ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক এবং প্রাক্তন শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী জনাব এম এ বাতেন। আসাফউদ্দৌলাহ, মাহফুজ, মালেক, সুলতানউল আজিজ এবং মহসীনের মত সাতারুদের খ্যাতি তখন বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরের বাইরেও বিশেষভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল।

১৯৫৬ সালে মেলবোর্ণ অলিম্পিকে চারজন পাকিস্তানী সাতারুকে পাঠান হয়। ব্রজেন পাকিস্তান চ্যাম্পিয়ন হয়েও রহস্যজনকভাবে বাদ পড়েন। আপত্তি উঠে। তৎকালীন ক্রীড়াবোর্ডের উপদেষ্টা খ্যাতিমান ক্রিকেটের কারদারকে পাঠান হয় এটা তদন্তের জন্যে। শেষ পর্যন্ত তিনিও কিছুই করতে পারেননি। খেলাধুলায় এমনি তারতম্যে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মানসিকতায় তখন থেকে অবহেলার স্রোত বইতে থাকে। এর পরিণতি পরবর্তীতে আরও প্রকট আকারে রূপ নেয়। ব্রজেন হতাশ হয়েও হাল ছাড়েননি। এ অবস্থায় একদিন ষ্টেটসম্যান পত্রিকায় দেখেন যে ভারতীয় নাগরিক মিহির সেন চারবার চেষ্টা করেও ইংলিশ প্রণালী অতিক্রম করতে পারেন নি। না পারাতেই তাঁর জন্য পত্রিকায় পাঁচ কলাম লিখা হয়েছে অবাক হন।

ব্রজেন সাংবাদিক এস এ মান্নানের (লাডুভাই) নিকট তাঁর ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। তাঁকে রাজী করিয়ে কলকাতা নিয়ে যান। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে নিজ পরিচয় না দিয়ে মিহির সেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ইংলিশ চ্যানেলে সাঁতার সম্পর্কে তাঁকে নানা প্রশ্ন করে বিস্তারিত জেনে নেন। ঢাকায় ফিরে এসে ব্রজেন দীর্ঘ পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। যথাযথ খাবার এবং পর্যাপ্ত অনুশীলনের পর প্রথম ঢাকা ষ্টেডিয়াম সুইমিং পুলে ১৯৫৭ সালে ১২ মাইল একটানা সাঁতার কাটেন। বিচারপতি ইব্রাহিম এই

সাঁতারের উদ্বোধন করেন। একমাস পর একই স্থানে তিনি ২৬ মাইল ম্যারাথন সাঁতার সম্পন্ন করেন। ঐ বছরই সেপ্টেম্বর মাসে তিনি মহসীন ভাইয়ের সঙ্গে আলোচনান্তে এবং তাঁর দ্বারা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা প্রদানে উক্ত পুলে একসঙ্গে ৪৮ ঘন্টা সাঁতার শুরু করেন। এতে মহসীন ভাইয়ের নেতৃত্বে যাঁরা সর্বতোভাবে সহায়তা করেন ব্রজেন দাস আজও শ্রদ্ধাভরে তাঁদের স্মরণ করেন। এঁরা ছিলেন সর্বজনাব মহম্মদ আলি, জনাব ও বেগম শাহজাহান, আমিরউদ্দিন, মুসা, তৌফিক আজিজ, ননী বসাক ও মিসেস বসাক, ডাঃ নন্দী, ডাঃ বণিক ও ডাঃ আজম।

এই ৪৮ ঘন্টা সাঁতার ছিল সেকালে ব্রজেনের জন্য একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ। তাঁর বাবা মা ২৪ ঘন্টা পর খবর পেয়ে ছেলেকে দেখতে এসে হতভম্ব হয়ে যান। মা কাঁদেন। সাঁতার অবস্থায় ব্রজেন তাঁকে সান্ত্বনা দেন।রাতে সাংবাদিক মুসা এসে জানান, বাবু নিউজ দিয়ে এলাম। আমরা যেন বেইজ্জতি না হই। সাঁতার অবশ্যই চালিয়ে যেতে হবে। না পারলে আপনি বাঁশের বারি খাবেন, আর আমাদের চাকুরী থাকবে না। ব্রজেন সম্মতি দিলেন। তিনি স্থির প্রতিজ্ঞ ছিলেন।দ্বিতীয় দিন রাত আটটার পর হাত উঠাতে না পেরে পানির নীচে টেনে সাঁতার কাটেন। সকালে সূর্য উঠার সঙ্গে সঙ্গে পানি গরম হলে হাতে তাঁর শক্তি ফিরে আসে। তিনি ৪৮ ঘন্টা পর আরো এগুতে চাইলে তৎকালীন যুব্য মন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান খান তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে আর না এগুতে বারণ করেন। পানি থেকে উঠিয়ে নেন।

এই সাঁতারের পর ব্রজেন ভাবেন যে ইংলিশ প্রণালীর পানিতো ঢাকা ষ্টেডিয়াম পুলের মত স্থির নয়। ঠাণ্ডা পানি, ঢেউ, স্রোত, বাতাস,জলজ জন্তু, বিষাক্ত প্রাণী ইত্যাদি মিলিয়ে সেখানে রয়েছে কত বাধা। কোথায় তাঁর সে অভিজ্ঞতা। কিছুদিন পরই স্থির করলেন নারায়নগঞ্জ চাঁদপুর নদীতে লঞ্চে ভ্রমণ করে সারেংদের সঙ্গে কথা বলে জরিপ করবেন,তারপর অগ্রসর হবেন। ধরলেন মহসীন ভাইকে। রাজী করালেন। শুরু হল এই সাঁতার। লোক লস্কর সাজ সরঞ্জাম পর্যাপ্ত। ব্রিগেডিয়ার সাহেবদাদ তখন ই পি এস এফ-এর সভাপতি। দিলেন দু'জন রাইফেলধারীকে। ব্রজেনের অনুসারী বোটে পাহারা হিসাবে। উদ্দেশ্য তাঁকে জলজ জন্তুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করা। তিনি স্বচ্ছন্দে সাঁতর কাটলেন দীর্ঘ পথ। সকাল থেকে মেঘনার দুধারে হাজার হাজার লোকের ভিড়। এক নয়নাভিরাম দৃশ্য। চাঁদপুরের মোহনায় পৌছে হঠাৎ কালবৈশাখীর ঝড়ে দলের

অন্যান্যের জাহাজ ও নৌকা এদিক ও দিক ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল। প্রায় সকলেই কূলে প্রাণভয়ে আশ্রয় নিলেন। ব্রজেনকে ঝড়ের তান্ডব থেকে রক্ষা করার জন্য অসষ্ট্রিচ জাহাজে জোর করে তুলে নেয়া হল।

ইতিমধ্যে তিনি প্রায় ৪৫ মাইল পথ শেষ করেছেন। মধ্যগাঙ্গে চরের শেষ মাথা থেকে মেঘনা অতিক্রম করে চাঁদপুর শহরে পৌছার কথা। হাজার হাজার লোক চাঁদপুর ঘাটে সমবেত। তাঁকে স্বাগত জানাতে। ব্রজেনের ভবিষ্যত পরিকল্পনা ইংলিশ চ্যানেল সাঁতারে যাবার পথ প্রশস্ত হল। এরপর ঢাকায় ফিরে তৈরী হয় পাকিস্তান চ্যানেল ক্রসিং কমিটি। সভাপতি হলেন মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান এবং সম্পাদক মহসীন ভাই। অন্যান্যের মধ্যে যাঁরা বিশেষভাবে সক্রিয় ছিলেন তাঁরা হলেন সর্বজনাব আমির উদ্দিন ও ফকরুল ইসলাম, কাজী সামসুল ইসলাম, শাহজাহান মহম্মদ আলী এবং এস এ মান্নান (লাডুভাই)। ইতিপূর্বে ষ্টেডিয়াম পুলে অনুষ্ঠিত সাঁতার কমিটির সকলেই রয়ে গেলেন সে কমিটিতে।

বিলেতে যাওয়া। অনেক দিন থাকা। প্রথম অনুশীলন। পানি ও আবহাওয়ার সঙ্গে পরিচিত হওয়া। তারপর প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়া। এটাই ছিল পরিকল্পনা। অর্থ সংগ্রহের তদবির জোরদার করা হল নানা ভাবে। এমন কি ব্যক্তি বিশেষের উপর বিভিন্ন চাপ সৃষ্টি করে। ঢাকার তৎকালীন জেলা প্রশাসক দাবাড়ু নিয়াজ মোর্শেদের নানা আলি আহমদ সাহেব ও ব্যারিষ্টার জমির উদ্দিন সাহেব এগিয়ে এলেন। কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রী তখন জহিরউদ্দিন সাহেব। সরাসরি কিছু করতে ইতস্তত করছিলেন।মন্ত্রী সাহেবের মতে ব্রজেনের ধর্মও ছিল পাকিস্তানীদের কাছে একটি বাধা। পরে সিলেটের পি কে দাস শিক্ষামন্ত্রী হন। এ কে দত্ত অর্থ উপমন্ত্রী। এসময় তমিজউদ্দীন খান অর্থমন্ত্রী হলে ব্রজেনকে তাঁরা সর্বতোভাবে সাহায্য ও সহযোগিতার আশ্বাস দেন। দিন তারিখ ঠিক হয়। ১৯৫৮ সালের মে মাসে মহসীন ভাইকে ম্যানেজার এবং মহম্মদ আলিকে কোচ করে ব্রজেন করাচী হয়ে রওনা হন বিলেতের পথে। করাচীতে দোয়া নিয়ে যান শহীদ সোহরাওয়ার্দীর। সোহরাওয়ার্দী সাহেব ব্যক্তিগত চিঠি লিখে দেন বিলেতে পাকিস্তানী হাইকমিশনার তাঁর ঘনিষ্ঠ আত্মীয় একরাম উল্লাহ সাহেবকে। সরকার মঞ্জুরীকৃত ১৪০০ পাউণ্ডের মধ্যে ষ্টেট ব্যাংক মাত্র ৭০০ পাউণ্ড ছাড় করেন। বাকীটা পরে লণ্ডন হাইকমিশনে যেয়ে পাবেন বলে জানিয়ে দেন। বিলেতে বুলটিন চ্যানেল প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়াই ছিল তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য। চ্যানেল সন্নিকটে

বুলটিন নামে একটি বড় হোটেলের মালিক নিয়মিত এ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করতেন।

১৯৫৮ সালে প্রথম বারের প্রতিযোগিতায় ২৯ জন সাতারুর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের মহিলা প্রাক্তন অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন গ্রীটা এণ্ডারসন প্রথম হন। পুরুষদের মধ্যে ব্রজেন ১ম হন। তিনি সার্বিক প্রতিযোগিতায় ২য় হন। দেশে ফিরলে করাচীতে কমিশনার এন এম খান তাঁর জন্য বীরোচিত সম্বর্ধনার আয়োজন করেন। আইয়ুব খান তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরেন। দেশের গর্ব বলে উল্লেখ করেন। ব্রজেন তাঁকে একটি টাই ও চ্যানেলে সাঁতারের ছবি উপহার দেন।

ঢাকায় এসে কার্জন হলের সম্বর্ধনায় মার্শাল-ল প্রশাসক মেজর জেনারেল ওমরাও খানও যোগ দেন। ১৯৫৯ সালে সরাসরি প্রেসিডেন্টের সহায়তায় আবার চ্যানেল ক্রসিং-এ যাত্রা করেন। প্রথম ইটালীর ক্যাপরি থেকে নেপলস পর্যন্ত ৩৫ মাইল সাঁতারে ২য় হন। এ সময় মোহম্মদ আলি তার ম্যানেজার ছিলেন। তারপর ইংল্যাণ্ড থেকে ফরাসী উপকূল পর্যন্ত সাঁতার অতিক্রম করেন। এতে কোন প্রতিযোগিতা ছিল না। ১৯৬০ সালে সরকারী উদ্যোগে তিনি কাজী রকিবকে ম্যানেজার নিয়ে ফ্রান্স থেকে ইংল্যাণ্ড পর্যন্ত আবার সাঁতার কাটেন। হঠাৎ পানির গতির পরিবর্তনে তীরে পৌছতে তাঁর এক ঘন্টা বিলম্ব হয়। তিনি অল্পের জন্য বিশ্বরেকর্ড করা থেকে বঞ্চিত হন। এরপর মোহম্মদ আলীকে ম্যানেজার নিয়ে ১৯৬১ সালে দুবার চ্যানেল অতিক্রম করা কালে দ্বিতীয় বারে একই সঙ্গে দুটি বিশ্বরেকর্ড করেন।ইংল্যান্ডের রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ এই সালে বিশ্বরেকর্ড করার জন্য ব্রজেনকে ব্যক্তিগতভাবে অভিনন্দন জানান।

শেষ দিন ভোর বেলা তীরে পৌছে সাংবাদিক এবং দর্শকের ভিড়ে ও তাঁদের আনন্দউল্লাসে তাঁর মনের বাসনা পূর্ণ হয়েছে জেনে মহান আল্লাহর কাছে শোকর গোজার করেন। দেশে ফিরলে তাঁকে যে সম্বর্ধনা এবং সম্মান দেয়া হয় তা কোন খেলায়ই আজ পর্যন্ত কোন বাংলাদেশী পাননি। তারপরে চাঁদপুরের ছেলে মালেক ১৯৬৪ সালে এবং ১৯৮৯ সালে বিক্রমপুরের আরেক ছেলে এ কালের কৃতী সাঁতারু মোশাররফ ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করেন। সাঁতারে ব্রজেনের সেই নাম ডাকের চ্যালেঞ্জ আজকের সাঁতারুরা নিক এটা ব্রজেনের আন্তরিক ইচ্ছা। একমাত্র মোশাররফের পক্ষেই তা হতে পারে সম্ভব।

আমাদের খেলার ইতিহাসে ব্রজেন দাস নামটি অব্যয় অক্ষয় হয়ে থাকবে। স্বাতন্ত্র অবিরত স্বীকৃতি পাবে। তাতে মূল্যায়িত হবে তাঁর অদম্য সাহস অফুরন্ত

উদ্দীপনা।একনিষ্ঠ এক নিবেদিত প্রাণ। লক্ষ্য স্থির রেখে এগিয়ে যাওয়া। প্রাণপণ শপথে অটল থাকা। একদিন দীর্ঘ আলোচনায় ব্রজেন নিজেকে উজাড় করে দিলেন নিজের ভাষায় এমনি করে—"সাফল্য আসবেই। তবে দরকার ভাল কোচ। কর্তৃপক্ষের সক্রিয় সাহায্য ও আন্তরিক সহযোগিতা।সাঁতারে হতে হবে কঠোর নিয়মী ও গভীর মনোযোগী। থাকতে হবে চিন্তামুক্ত। হতে হবে চরিত্রবান। ফুলের মত পবিত্র। শিশুর মত নিষ্পাপ। আমার মা বাবা আমাকে কোনদিন সাঁতার কাটতে বাধা দেননি। তাঁদের প্রাণঢালা আশীর্বাদই ছিল আমার পাথেয়। কথাগুলি বলার সময় ব্রজেন যেন অবলীলায় সাঁতরে এলেন বিশ্বের বড় বড় মহাসাগরগুলি। বাংলা ও বাঙ্গালীর এক অসাধারণ ক্রীড়া প্রতিভা নতুন করে ঝলসে উঠছিল সেদিন আমার বসার ঘরটিতে।

১৯৬০ সালের চ্যানেলে নামার পূর্বমুহূর্তে ব্রজেন দাস ।

১৯৫৬ সালে করাচীতে আন্তবিশ্ববিদ্যালয় সাঁতার প্রতিযোগীতায় প্রধান মন্ত্রী সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদল। অধিনায়ক ছিলেন ব্রজেন দাস।

১১৯৮৬ সালে ইংল্যাণ্ডের ফোকষ্টন চ্যানেল সুইমিং এসোসিয়েশনের সভাপতি স্কটের নিকট থেকে কিংঅব চ্যানেল ট্রফি নিচ্ছেন ব্রজেন দাস। ১৯৬১ থেকে আজ পর্যন্ত এ ট্রফি আর কেউ পাননি। পাশে মহিলা চ্যানেল অতিক্রমকারী সাতারু বিলেতের রোজমেরী জর্জ এবং অন্যজন তুরস্কের সাতারু।

১৯৬০ সালে ইংল্যাণ্ডে ডেনমার্কের চ্যানেল সাঁতারু হেলডি ও ব্রজেন দাস। হেলডি ইংল্যাণ্ড থেকে ফ্রান্স পর্যন্ত এবং ব্রজেন ফ্রান্স থেকে ইংল্যাণ্ড পর্যন্ত সাঁতারে বিশ্ব রেকর্ড করেন।

১৯৫৮ সালে করাচীতে সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে পাক প্রেসিডেন্ট আইউব খানের পাশে ব্রজেন দাস ও তাঁর ম্যানেজার কে এ রকিব।

১৯৬১ সালে ইংল্যাণ্ডে পাকিস্তান হাই কমিশনে সম্বর্ধনায় বৃটিশ ভারতের সর্বশেষ গর্ভণর জেনারেল লর্ড মাউন্ট বেটেনের সঙ্গে কথা বলছেন ব্রজেন দাস।